বিচ্ছিন্ন জীবন

জীবন যাপনে, খাদ্য আহরণে বেঁচে থাকাই মানুষের মৌলিক বিষয়। এর জন্যে তার সংগ্রাম। বেঁচে থাকার গড় বয়স কত হবে, ৪৫ বা ৬০ বছর। আর একটি হিসাবে দেখা গেছে, একজন মানুষের বেঁচে থাকা সময়টিতে তার সব সংগ্রাম বা চলাচল মাত্র ৫০ মাইল বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই বেঁচে থাকা, আজন্ম চলাচল এতো সীমিত অথচ সেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি সংসার সীমা থেকে, সাংস্কৃতিক চেনা পরিস্থিতি থেকে। এটাই জীবন... লিখেছেন **মোহসিউল আদনান ও সাইফুল হাসান**

ষাট দশকের শুরুতেই বাড়িটির কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। তখন আশপাশে অল্প কিছু বাড়ি হয়েছিল। সবগুলো প্রায় একই প্যাটার্নের। ফুলের বাগান আর দেয়াল ঘেঁষা নারকেল, আম, কাঁঠাল গাছ। দু'একটার গেটে মাধবীলতা ঝাপটানো। সকালবেলায় পাখির ডাক। এই চল্লিশ বছরে বাড়িটি দেখেছে অনেক পরিবর্তন। তিন যুগেরও বেশি সময়ের সাক্ষী বাড়িটি তার নির্মাতার মৃত্যু দেখেছে, দেখেছে বড় প্লটগুলোর ছোট হয়ে আসা, ছয় তলায় ১০-১৫টি ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়া। সামনের রাস্তায় গাড়ির চলাচল বেড়েছে অনেক, হর্নের শব্দ রাত ১টা-২টাতেও নিয়মিত....

বাড়িটির ভেতরে ঢোকা যাক। দ্বিতীয় প্রজন্মই গৃহকর্তা এখন। সত্তরে পা দিতে বাকি চার-পাঁচ বছর। গৃহকর্ত্রী পঞ্চাশ পার করেছেন। দম্পতির তিন সন্তান। দুই ছেলে, এক মেয়ে। বিয়ে হয়েছে

সবার। ছেলে দুটি আমেরিকায় আছে নব্বইয়ের শুরু থেকেই। আর মেয়ের বিয়ে হলো নব্বইয়ের শেষে। গন্তব্য সেই পশ্চিমেই, কানাডায় স্থায়ীবাসকে বেছে নিয়েছে সে। সকাল-দুপুর-রাত, গভীর রাত সব সময় বাড়িটির পরিবেশ একই। প্রায় পিন-পতন শব্দ। মাঝেমধ্যে কাজের লোকের উঁচু গলার কথা। নীরবতা ভাঙে এভাবেই। গৃহকর্তারা ছিলেন চার ভাই, তিন বোন। বেঁচে আছেন শুধু সত্তরোর্ধ্ব এক ভাই। তার পরিবারের চিত্রও প্রায় এক। মাঝে মাঝে, তিন মাসে একবার আসেন। আলাপের বিষয় একই সব সময়। ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা, মুসলমানদের অবস্থা সেখানে কেমন, আর বুশের ওপর ক্রোধ প্রশমন... এই নিয়ে দুপুর থেকে রাতের খাবার টেবিল। সেদিন বাড়িটিতে প্রাণ আসে। তারপর আবার সেই পিন-পতন নীরবতা, যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাস। অবশ্য এখানেও রুটিনমাফিক জীবন তার। এরই মাঝে জীবনের স্বাদ, আনন্দ খুঁজে নেবার প্রয়াস চলে নিরন্তর। রাত/সকালে ঘুম ভেঙে ভোরের জন্য অপেক্ষা। তারপর মর্নিংওয়াক। সেখানে আছে সমবয়সী, এখন বন্ধু প্রায়। হাঁটার চেয়ে গল্প, আড্ডাটাই মুখ্য। দেশের রাজনীতির সাত-সতেরো প্রায় সবারই মুখস্থ। কি হলো দেশটার! কি করলে কত এগিয়ে থাকতো। প্রায় প্রতিদিন একই বিষয়ে আলোচনা। বাসায় ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই ঝগড়া শুরু। তারপর কিছুক্ষণের বিরতি এবং নাস্তার টেবিলে খবরের কাগজ নিয়ে বসা। এরপর দুপুর পর্যন্ত কিছু না করা বা কিছু একটা করা, পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি, বাড়ির পর্যবেক্ষণ, ফোনে এর-ওর খবর নেয়া। দুপুরে সময় মতো খাওয়া, সঙ্গে ওষুধ কোনো না কোনো রোগের। তারপর ঘুমিয়ে, না ঘুমিয়ে বিকেলে আসা। মাঝেমধ্যে আবার হাঁটতে যাওয়া, সন্ধ্যার পর দাওয়াত থাকলে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া, না হলে বাড়িতে টিভি দেখে রাত কাটানো। এরই মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে সন্তান আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে আলোচনা। তাদের স্মৃতিতে কিছুক্ষণ নিজেকে ডুবিয়ে রাখা আর মাসে দুই রবিবার তাদেরকে ফোনে কথা বলার আনন্দে ভেসে যাওয়া।

এটা এক ক্ষমতাবান, বিত্তবান গৃহকর্তার জীবন সায়াহ্নের জীবন ছক। মাঝেমধ্যে তিনি ভাবেন জীবনের প্রাপ্তি, লক্ষ্য কি এই? জীবনের এই ছিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নতাবোধ কেন হয়? সন্তান, নাতি-নাতনিরা যেন ভালো থাকে সেজন্যই তো বেছে নেয়া এ পথ। আবেগ দিয়ে নয়; যুক্তি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সুখের ঠিকানার সন্ধান করেছিলেন। সন্তানদেরও গন্তব্য ঠিক করে দিয়েছেন। আচ্ছা, সন্তানরা কিভাবে বেড়ে উঠছে? বিচ্ছিন্নভাবে, না সময়ের সঙ্গে পা রাখছে পরিপূর্ণতার পথে?

শিকাগোতে থাকা ছেলেটির জীবন ছকে যাওয়া যাক। সে ব্যস্ত, খুবই ব্যস্ত তার চাকরি নিয়ে। এখন চলছে ছাঁটাই আর ছাঁটাই। প্রতিনিয়ত নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে, নিজেকেই নিজের টপকাতে হচ্ছে আরো দক্ষতা দিয়ে। প্রবাসী পুত্রবধূটিও একই পেশাদারি জীবনছকে বাঁধা হয়ে পড়ছে। নাতিটি এখন স্কুলে যায় আর নাতনিটিকে রেখে আসা হয় ডে কেয়ার সেন্টারে। শিকাগোতে ছেলেটির পুরো পরিবারের জীবন রুটিনমাফিক, প্রচন্ড পরিশ্রমের। রবিবার বাড়ির, নাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ। পাঁচ দিনের অনেক কষ্টের পরে অল্প সময়ে অনেক আনন্দ, সুখের সন্ধান।

তাহলে সুখ কি এই বিচ্ছিন্ন জীবনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে? নাকি সুখের সন্ধান করতে গিয়ে ভুল পথে বা নির্দিষ্টভাবেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জীবনে? এই পরিবারটি অঙ্ক করে জীবনকে চালাচ্ছে। এখানে ভুল নেই, ভুল হবার কথাও নয়; যা হয়েছে, হচ্ছে তা হলো নিয়তি। এটাই অলক্ষে, অস্পষ্ট থাকা গন্তব্যের রূপ। 'ভালো' থাকার চেষ্টার অপ্রতিরোধ্য ফলাফল। এই ফল শুধু বাংলাদেশের দু'চারটি পরিবারে সীমাবদ্ধ নয়। বিচ্ছিন্ন জীবনে জড়িয়ে আছে পুরো বাংলাদেশ, এমনকি পুরো বিশ্ব। উন্নত বিশ্বে এর চিত্র আরো ভয়াবহ। মুম্বাইর রিচি শর্মার কথা ধরা যাক। তিনি ঢাকার এক বায়িং হাউজে চাকরি করেন। বিয়ে হয়েছে তিন বছর। স্বামীকে থাকতে হয় থাইল্যান্ডে। সেখানে এক কোম্পানিতে চাকরি করেন। তিন-চার মাসে তিন থেকে সাত দিনের জন্য তারা একসঙ্গে থাকেন। এই জীবনে তারা অভ্যস্ত হচ্ছেন, হতে হচ্ছে। কেননা টার্গেট বেছে নিয়েছেন তারা। এমন লক্ষ্যে কেন আগাচ্ছে এই প্রজন্ম? উপায় নেই বলেই হয়ত। স্বাভাবিক সূত্রেই আছে এর উত্তর। লোক বেশি, জায়গা, উপযুক্ত জায়গা কম। আর অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ক্ষেত্রে এটা অনেক নির্মম সত্য। এসব দেশের বর্তমান প্রজন্ম জেনে গেছে তার কাজটা, তার জীবনটা সাজিয়ে দেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তাকে অমানবিক কঠিন জীবনের পথ ধরেই চলতে হবে। সেখানে এক থাকতে পারলে ভালো, বিচ্ছিন্ন থাকার প্রশ্ন উঠলে তা কোনো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার উপায় নেই। কারণ অপশনহীন জীবন যাত্রা। আত্মকেন্দ্রিকভাবে বেড়ে উঠতে উঠতে সে একসময় হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্ন একটি মানুষ, পরিবার থেকে একক। আবার একইভাবে পুরো পরিবারের সবাই হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্ন।

এতক্ষণ আলোচনা হলো যারা হিসাব কষে জীবনের ছক

বুয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা আর মাঝে মধ্যে টিভির ছোট পর্দায় জীবনের সব আনন্দ খুঁজে বেড়ানো। সে এটাও বোঝে না তার বাবা-ভাই তারই টাকায় নিজেদের নামে জমি কিনে তাকে প্রতারিত করছে। আসলে এভাবে প্রতারিত হতে হতে এটাই নিয়ম বলে ধরে নিয়েছে সে। সে খুশি তার ভাইটি শিক্ষিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবোধ তার আছে তীব্রভাবেই। সে এখনো বাড়ি ফিরতে চায়, চায় মাঠে পুকুরে দাপাদাপি করতে, সখীদের সঙ্গে গল্প করতে, ঘোরাঘুরি করতে

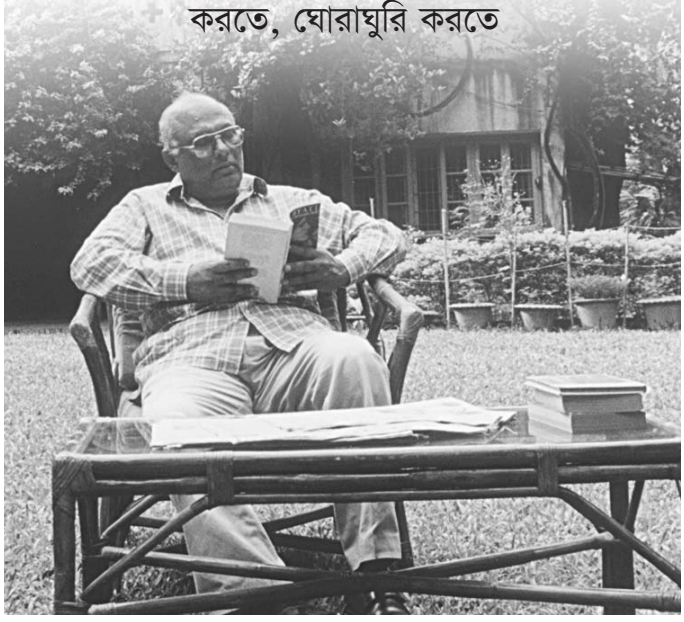

কাটেন, কাটছেন তাদের নিয়ে। বিত্তের হিসাবে উঁচুতে অবস্থান। তারা কোনোভাবে বিত্তের উচ্চতা থেকে নামতে চান না বলেই এই বিচ্ছিন্নতাকে বেছে নিয়েছেন। অন্যরা কিভাবে কাটাচ্ছে? মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত? নিম্নবিত্তের প্রসঙ্গেই আসি না কেন। সেই বাড়িটিতে আবার ফেরা যাক। ড্রাইভার রফিক এখানে চাকরি করেন আট বছর। এখন পরিবারের অংশ হয়ে পড়ছেন। বৃদ্ধ গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। অনেকটা ম্যানেজারের মতো তার ভূমিকা পরিবারে। ব্যাংকের টুকটাক কাজ, বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাস বিল জমা দেয়া, বাড়ির ছোটখাটো কাজে তদারকি, মিস্ত্রিদের ওপর খবরদারি- সবকিছুর দায়িত্ব রফিকের ওপর। রফিকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। স্ত্রী, তিন সন্তান নোয়াখালীতে। ঢাকা থেকে চার-পাঁচ ঘন্টার যাতায়াত। তাও যাওয়া হয় না মাসে। তিন মাস পর পর চার দিনের ছুটি। আর ধান কাটার সময় দুই সপ্তাহের ছুটি মেলে। ড্রাইভারি করে যে টাকা জমেছে তাতে গ্রামে বেশ কিছু জমি কেনা হয়েছে। নতুন ঘর হয়েছে। কিন্তু এভাবে একা থাকা দুঃসহনীয় লাগে মাঝেমধ্যে। সন্তানের মুখে বাবা ডাক শোনার জন্য অপেক্ষা হয়ে ওঠে কয়েক কালের। একবার সবাইকে নিয়ে এলো ঢাকায়। সংসার চালানোর মতো আয় করে বলেই সিদ্ধান্তটা সে নিতে পেরেছিল। কিন্তু সবাই আসার পর দেখল অন্য চিত্র। সন্তানের বাবা ডাক শোনা যায়। কিন্তু মাস শেষে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য জমে না কিছু। স্ত্রীর সোহাগ মিটতে না মিটতেই কপালে ভেসে ওঠে অন্ধকার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তাময় রেখা। আবার একই সঙ্গে শুরু হয় গ্রামে ফেলে আসা জমি নিয়ে কোন্দল। নিজের ভাইয়েরাই আত্মসাতের চেষ্টায় লিপ্ত। বাধ্য হয় পুরনো জীবনে ফিরে যেতে। অনেক সমস্যার সমাধান হিসেবে তাকে ফিরে আসতে হয় অপ্রতিরোধ্য বিচ্ছিন্ন জীবনে। তার স্ত্রী, সন্তানকেও গ্রামের বেষ্টনিতে বন্দি হতে হয়। শৃঙ্খলিত হয় পুরো পরিবারের এক সঙ্গে থাকার স্বপ্ন। ড্রাইভার রফিক, তার পরিবার বন্দি হয় বিচ্ছিন্নতার শেকলে ।

রফিককে সংসারের হাল ধরার কথা মাথায় রাখতে হয়। তাকে এই জীবন মেনে নিতে হতে পারে। ভবিষ্যতে ভালো থাকবে ভেবে অবস্থান হারাতে চায় না সে। কিন্তু একটি গ্রাম্য কিশোরীকে জীবন কোন পথে টেনে নেয়? একটি বাড়িতে কাজ করা পারুলের কথাই ধরা যাক। বিচ্ছিন্ন হবার জন্য সে ঢাকায় আসেনি। এসেছিল শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে। তাও নিজের গরজে নয়। রংপুর থেকে তার বাবা এখানে দিয়ে যায় তাকে। শুধু তাকেই নয়, একে একে তার আরো তিন বোন তিন বাড়িতে কাজ করছে। বাবাটাও কোনো এক বাসায় দারোয়ানের চাকরি নিয়েছে। আর রংপুরের বাড়িতে ভিটেমাটি দেখে রাখছে মা আর ভাই। মাস শেষে বাবা এসে বেতনের টাকাটা নিয়ে যাচ্ছে মেয়েদের কাছ থেকে। পরিশ্রমে ক্লান্ত পারুল আর অন্যান্য বোনদের টাকার আনন্দে দিন কাটাচ্ছে ভাইটি, বাবা। জমি কিনছে নিজেদের নামে। তেরো বছরের মেয়েটিকে উপার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বাবাটি মোটেই বিচলিত নন। তবে হ্যাঁ, শুরুতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। এখন কন্যাদের টাকায় এমন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তাকে বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করে না। মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে সব সময়। এখানে বাবাটি ভাইটি আপাতসুখের সন্ধান পেয়েছে, ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তায় তারা নিশ্চিন্ত। কিন্তু পারুল কেমন জীবন কাটাচ্ছে? কোনো কিশোরীর সঙ্গে গল্প বা খেলার উপায় নেই তার। বুয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা আর মাঝে মধ্যে টিভির ছোট পর্দায় জীবনের সব আনন্দ খুঁজে বেড়ানো। সে এটাও বোঝে না তার বাবা-ভাই তারই টাকায় নিজেদের নামে জমি কিনে তাকে প্রতারিত করছে। আসলে এভাবে প্রতারিত হতে হতে এটাই নিয়ম বলে ধরে নিয়েছে সে। সে খুশি তার ভাইটি শিক্ষিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবোধ তার আছে তীব্রভাবেই। সে এখনো বাড়ি ফিরতে চায়, চায় মাঠে পুকুরে দাপাদাপি করতে, সখীদের সঙ্গে গল্প করতে, ঘোরাঘুরি করতে। এটুকু বুঝেছে, সে সময়টাও পার হয়ে গেছে প্রায়। এটাই জীবন, এভাবেই কাটছে সময়, এটাই হবার কথা ছিলো, পরিবারের মানেই এমন। বিচ্ছিন্নতা জীবনেরই অংশ। বিচ্ছিন্ন জীবন তার কাছে এখন দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তার সঙ্গে ভালো কাপড়ের নিশ্চয়তা, বাবার মুখে হাসি, ভাইয়ের শিক্ষিত হওয়া। হ্যাঁ মাঝে মাঝে সে স্বপ্ন দেখে। গ্রামের বাড়িতে সবাই এক সঙ্গে থাকছে!

মাঝেমধ্যে আবার হাঁটতে যাওয়া, সন্ধ্যার পর দাওয়াত থাকলে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া, না হলে বাড়িতে টিভি দেখে রাত কাটানো। এরই মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে সন্তান আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে আলোচনা। তাদের স্মৃতিতে কিছুক্ষণ নিজেকে ডুবিয়ে রাখা আর মাসে দুই রবিবার তাদেরকে ফোনে কথা বলার আনন্দে ভেসে যাওয়া

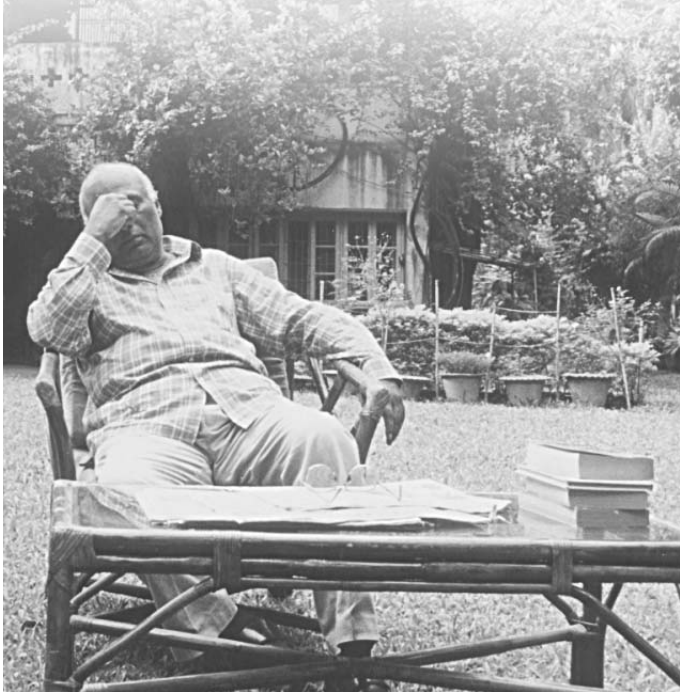

বাড়িটির সীমানা থেকে একটু বের হই। দেয়াল টপকে ঢাকাকে দেখা যাক, সবাই ছুটছে, ছুটতে হচ্ছে। এখানে যে ছুটতে পারে না, সে পরাজিত, ব্যর্থ। প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি মানুষকে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হচ্ছে নিজের অবস্থানে টিকে থাকার জন্য কিংবা আরো ভালো অবস্থানে যাবার জন্য। অথবা নিচে নামার গতিকে শ্লথ করার চেষ্টা সর্বত্র। এর বাইরেও সংগ্রাম আছে, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার চেষ্টা, এরা গতকাল ভাবে না, আগামী কালও ভাবায় না তাদের। শুধু আজকে নিয়েই চিন্তা। দিন এনে দিন খেতে হয় তাদের। নেই নির্দিষ্ট কাজের স্থান। প্রয়োজনে দেশের এ মাথা থেকে ও মাথা যেতে হয় তাদেরকে। শ্রমিক, দিনশ্রমিক।

মোহাম্মাদিয়া হাউজিংয়ে প্রতিদিন সকালে হাট বসে এমন শ্রমিকদের। সবাই নির্মাণ শ্রমিক। সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন

জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, কাজ পেলে কাজ করে। ভোলা থেকে এসেছে এমন একটি গ্রুপ। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ১০। এদের একজন খালেক মজুমদার। বাড়ি ভোলা সদর থানার ইলিশিয়া গ্রামে। বাড়ি থেকে এসেছে দুই বছর। এর মধ্যে বাড়ি যায়নি একবারও। ৪ সন্তান, স্ত্রী বাবা-মা নিয়ে তার পরিবার। সবাই গ্রামে। খালেক যখন বাড়ি থেকে আসে তখন স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলো অন্তত প্রতি তিন মাসে একবার বাড়িতে ফিরবে। কিন্তু বাড়ি ফেরার জন্য যতটুকু টাকা জমানো দরকার, ততোটা খালেকের কখনও হয়ে ওঠে না। পরপর চারদিন তারা মোহাম্মাদিয়া হাউজিংয়ে আসছে কিন্তু কাজ মেলেনি। আগের কাজ থেকে যে টাকা পেয়েছে তা দিয়েই চলছে এখন। একেবারে ছোট সন্তানটির কথা তার খুব মনে পড়ে। গ্রুপের কেউ যখন বাড়ির দিকে যায় তখন তার কাছে বাড়ির জন্য কিছু টাকা ধরিয়ে দেয়। কখনও ৫০০ কখনও বা এক/দেড়হাজার কিন্তু এই টাকায় সংসার কিভাবে চলে সেটা বোঝে খালেক। আবার গ্রামে তেমন কাজও নেই। গত দু'বছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটে কাজ করেছে। হাজার ৫/৭ টাকা জমাতে পারলেই বাড়ি ফেরার ইচ্ছা। যখন নির্মাণ শ্রমিকের কাজ থাকে না তখন রিকশা চালাতে হয়। থাকার কোনো ঠিক নেই। তবে মসজিদই প্রথম পছন্দ তার। বাড়ি বা বিল্ডিং তৈরির কাজ পেলে সেখানেই থাকা যায়। খালেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতোদিন বাড়ি ফেরেননি, সবাই আপনার পথ চেয়ে বসে আছে। একবারে অনেক টাকা না হোক অল্প কিছু টাকা হলেই তো বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারেন? উত্তরে খালেক বলেন, ' বাড়ির সবাই হয়তো আমার পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু পুরুষ মানুষ টাকা ছাড়া দাম নাই। বাড়ি যাওয়ার জন্য মনডা পোড়ায়। কিন্তু কি করবো? বেশি কিছু টাকা জমাতে পারলে বেশি দিন বাড়ি থাকতে পারবো। টাকা না থাকলে শুধু অশান্তি। বাচ্চার মায়ে অকম্মা পুরুষ বলে গালি দেয়। ভালোওবাসে। অশান্তি থেকে দূরে আছি। যা পারতাছি পাঠাচ্ছি, যেভাবেই হোক চলে যাচ্ছে। নিজের দু'চোখে দেখতে হচ্ছে না এই অশান্তি।' খালেকের চোখ ছলছল করে। ঘরে ফিরতে না পারার বেদনা তীব্র হয়। খালেকের পরিকল্পনা অর্থনীতির নানা যাঁতাকলে বারবারই ভেস্তে যায়। নিজের জীবন আর ঘর থেকে সে হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। নিজের অজান্তে, প্রচন্ড অনিচ্ছায়।

মানুষ পারিবারিক বিচ্ছিন্নতাকে অবধারিত ধরে নিচ্ছে। তারা গ্রাম ছেড়ে ঢাকা আসছে। দেখা যাচ্ছে ফরিদপুরের, শরিয়তপুরের শ্রমিকরা একত্রে কাছাকাছি থাকবে। যেমন ওয়ারী, টিকাটুলির কাজের বুয়ারা বেশিরভাগ এসেছে ফরিদপুর থেকে। এদিকে বনানী-মহাখালীতে দেখা যায়, নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জ থেকে আসা শ্রমিকদের। এটাই তার টান। প্রতিদিন কেউ না কেউ আসছে দেশের খবর পাচ্ছে। মা-বোনের খবর পাচ্ছে। এভাবেই লন্ডনে গড়ে ওঠে 'ব্রিক লেন', 'বাংলা টাউন'। নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস। দেশের মানুষের কাছাকাছি থেকে দেশের কাছাকাছি থাকা । ভালো থাকা। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাই।

নিজের অজান্তে হোক, আর হিসাব কষেই হোক এখন আল্টিমেট লক্ষ্য বা অবস্থান হচ্ছে বিচ্ছিন্ন জীবন। অবশ্য এটা ঠিক এই প্রক্রিয়া শুরু হয় বেশিরভাগ সময় অজান্তে, অনেক কিছু বুঝে ওঠার আগে। অনেক স্বপ্ন পূরণের পথই নিয়ে আসে এ পথে। এই প্রক্রিয়ায় অনেকে আসে ছাত্র জীবনেই। মফস্বল শহর থেকে একজন আসে উন্নত জীবনের ভিত রচনায়। তারপর অনেক পথ পাড়ি। সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরিবারের বন্ধন থেকে। এবং শেষমেশ ভাগ্য ভালো হলে সেই গৃহকর্তার মতো নিশ্চিন্ত জীবন। মূলত বিচ্ছিন্নতাই। আর সব হিসাব না মিললে ঝঞ্ঝাটযুক্ত বিচ্ছিন্নতা।

রাইহান জানে না ভবিষ্যতে কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতা অপেক্ষা করছে তার জন্য। তবে এখনই তার অনেক কিছুই ভালো লাগে না। বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে বাবা প্রচুর টাকা পাঠায়। খুব ভালোভাবেই তার দিন কাটে। ঢাকায় এসেছে ৬ বছর হলো। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে ঢাকা কলেজ থেকে। ঢাকায় প্রচুর বন্ধু/বান্ধবী আছে। পড়াশোনা, আড্ডায় ভালোই দিন কাটে তার। তারপরও মাঝে মাঝে কিছু একটা কিন্তু এসে ভর করে তার মনে। মাঝে মাঝেই রুমে ফিরে তার একা মনে হয়। ভীষণ একা মনে হয়। মাকে মনে পড়ে। বাবাকে। রাইহানের ভীষণ কান্না পায়। কিছুই করার নেই। এক খন্ড রুমের বাইরে তার নিজের কোনো জায়গা নেই। মন খারাপ হলে তার নিরিবিলি হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ছাদে ওঠা নিষেধ। রাত ১১টার মধ্যে রুমে না ফিরলে কলাপসিবল গেট বন্ধ।

পরিবারের শেষ প্রজন্ম প্রস্তুত হচ্ছে কোনো মতে দেশের সীমানা অতিক্রমের। যারা যেতে পারেননি তারাও নগরের কঠিন প্রতিযোগিতায় নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছেন। কাজের বাইরে যতটুকু সময়, সেখানে বাড়তি চিন্তার সময় নেই, আছে শুধু দুশ্চিন্তা, এখনকার সংসার চালানো আর অন্ধকার ভবিষ্যতের শিহরণের। প্রতিদিনের খরচের হিসাবে নাভিশ্বাসে জমে থাকা টেনশন, অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে পুরো পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে। ভাঙে দীর্ঘদিন ধরে রাখা আবেগী সম্পর্ক, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে হয় কয়েক টুকরো

দুটি বিচ্ছিন্ন জীবন

মাসে তিন লাখ টাকার হাতছানি

একজন জাপান প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রধান প্রতিবেদকের কথা হয়। ঘটনাটি তার মুখ থেকেই শোনা। ভদ্রলোক জীবন বদলাতে ১৩ বছর আগে জাপানে এসেছিলেন। দেশে রেখে এসেছিলেন স্ত্রী আর দু'সন্তান। আসার সময় তিনি তাদেরও বলে আসেননি। এখন তার পর্যাপ্ত অর্থ আর বিত্ত আছে। দামি গাড়িতে চড়েন। বেশ বড় একটি হোটেলের মালিক। ভিসা নেই, তাই গত ১৩ বছরে একবারও দেশে ফেরা হয়নি তার। দেশে এলে তাকে একেবারে চলে আসতে হবে। একদিকে ব্যবসা অর্থ প্রাচুর্য, অন্যদিকে স্ত্রী-সন্তান। ভদ্রলোক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না কি করবেন? উন্নত জীবন ও সেটা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি বোঝেন স্ত্রী-সন্তানরা তাকে দেখার জন্য কতটা কাতর! তিনিও তাই। একযুগের বেশি বাবা ডাক শোনেননি। আরও অনেক দিন হয়তো এভাবেই কাটবে। যখন তিনি জাপান যান তখন আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। এখন মাসে তার বড় অঙ্কের টাকা জমা হয় ব্যাংকে। প্রবাসে এখনও তার মনে পড়ে সেই কষ্টকর জীবনের কথা। বিশাল হাতছানি এড়িয়ে দেশে ফিরে কি করবেন? এই অনিশ্চয়তা তাকে চিন্তিত করে। অর্থের হিসাবে এই যে মানসিক পীড়ন, দ্বন্দ্ব এটাকে কাটানো সম্ভব নয়। একমাত্র কারণ নিশ্চিত জীবন। এই নিশ্চিত জীবনের হাতছানি তাকে করে ফেলেছে বিচ্ছিন্ন।

বাসা এবং বাড়ি এক নয়...

গাবতলীর হানিফ কাউন্টার। বাসটি যশোরের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। বাস কাউন্টারে কথা হয় মোঃ আওলাদ হোসেনের সঙ্গে। যাবেন নড়াইল। পেশায় ব্যবসায়ী। মিরপুরে নিজের বাড়ি আছে। গ্রামে যাচ্ছেন মাকে দেখতে। প্রায় ২৫ বছর ঢাকায় আছেন। ২/৩ মাস পরপরই বাড়িতে যান। বয়স যত বাড়ছে নড়াইলের প্রতি টানও বাড়ছে। ঢাকাতেই সন্তানেরা প্রতিষ্ঠিত। ২ ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এক ছেলে থাকে ইংল্যান্ডে। ছোট ছেলে তার সঙ্গে ব্যবসা দেখাশোনা করে। মিরপুরের বাড়িটি আওলাদ হোসেনের কাছে বাসা, বাড়ি নয়। বাড়ি মানে তার কাছে অন্যরকম একটা ব্যাপার। দোচালা টিনের ঘর, কয়েক বিঘা জমির

রাইহানের কাছে পারিবারিক গাঁথুনিটাই বড়। ঢাকায় সে যতোটা একা তার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে। রাইহানের কাছে এই শহর, উঁচু উঁচু বিল্ডিং তার নিজের মনে হয় না। এমনকি শিক্ষাসূত্রে যারা বন্ধু/বান্ধবী তারাও ঠিক যেন আপন নয়। এটা ভেবেই সে আঁতকে ওঠে, নিঃসঙ্গ হয় আর মায়ের কাছে ফেরার কথা ভাবে। সময় পেলেই বাড়ির দিকে ছোটে। শহরে পড়তে আসার পর থেকে সেটা হয়ে ওঠে না। এখন যেখানে থাকে, পার্শ্ববর্তীরা কেউ প্রতিবেশী নয়, এখানে সবাই ভাড়াটে কিংবা বাড়িওয়ালা। কারাগার যেমন বন্দীদের বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে, তেমনি হাজারো বিচ্ছিন্নতা এসে ভর করছে তার জীবনে।

রাইহানের বিচ্ছিন্নতা শুধু তাকেই গ্রাস করছে না, তার পরিবারও ডুবে আছে, যাচ্ছে এ জীবনে। গ্রাম, শহর থেকে ছুটে আসছে নগরে একটি প্রাণ। একক জীবনে বেড়ে উঠতে গিয়েই ছিন্ন হচ্ছে তার সম্পর্ক, এক সময় আবেগ-অনুভূতিও শিথিল হয়ে পড়ছে। গ্রামগুলোতে এখন কোলাহল আনন্দ অনেক বেড়ে যায় ঈদের ছুটিতে বা অন্য কোনো ছুটির সময়ে। সে আনন্দ জীবনের খন্ড অংশ হিসেবেই রয়ে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। বিচ্ছিন্নতা শুধু নগর ঢাকাকেন্দ্রিকই থাকছে না, এখানের বিচ্ছিন্ন একজনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য জীবনগুলো নিউইয়র্কেই থাকুক আর সিরাজগঞ্জেই থাকুক, তাও বিচ্ছিন্ন। সমষ্টিগত অবস্থান, চিন্তা-ভাবনা, কাজের ক্ষেত্র এক না হওয়াতে এ বিচ্ছিন্নতা প্রতিদিনই বাড়ছে প্রতিটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে। আবার খুব কাছাকাছি অবস্থানে থেকেও যে বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে দূরে থাকা যাচ্ছে তাও নয়।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কথাই ধরা যাক। বিচ্ছিন্নতা বিরোধী এই শ্রেণী। তারা ভাবতে ভালোবাসেন কাছাকাছি থেকে, নিয়মিত যোগাযোগের মধ্যেই জীবন কাটান তারা। কিন্তু এখন তা কতোটা বাস্তব? বরং মধ্যবিত্তই এখন সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন জীবনে অভ্যস্ত। পরিবারের শেষ প্রজন্ম প্রস্তুত হচ্ছে কোনো মতে দেশের সীমানা অতিক্রমের। যারা যেতে পারেননি তারাও নগরের কঠিন প্রতিযোগিতায় নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছেন। কাজের বাইরে যতটুকু সময়, সেখানে বাড়তি চিন্তার সময় নেই, আছে শুধু দুশ্চিন্তা, এখনকার সংসার চালানো আর অন্ধকার ভবিষ্যতের শিহরণের। প্রতিদিনের খরচের হিসাবে নাভিশ্বাসে জমে থাকা টেনশন, অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে পুরো

ওপর বাপ-চাচাদের বসত। বাড়ির সামনে একটা বড় পুকুর। চারধারে নানা ফলের গাছ। বাড়ির পেছন জুড়ে বিশাল ক্ষেত। শীতের সকালে খেজুরের রস, মায়ের নানা রকম পিঠার আয়োজন, ধানের গন্ধে মৌ মৌ সারা শৈশব, দল বেঁধে যাত্রা দেখতে যাওয়া, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে প্রতিবেশীদের একত্রিত উৎসব, নানা পার্বণ- এমন অসংখ্য ছোট ছোট ফ্রেমে বাঁধা আওলাদ হোসেনের বাড়ি। আওলাদ হোসেন বলেন, 'আমার বাসা, আমার সন্তানের বাড়ি। সে বাড়ি বলতে এটাই বোঝে। ঢাকা শহরে নিজেকে সবসময় আগন্তুক মনে হয়। নিজের মনে হয় না। এজন্য সময় পেলেই বাড়ি ছুটি। সময় না পেলে সময় যেকোনো মূল্যে বের করি। নিজের গ্রামে যে প্রশান্তি তার কোনো আর্থিক মূল্য হয় না। যদিও গ্রামীণ কাঠামোর মাঝেও প্রচুর ভাঙন এসেছে। অনেক বৈপরীত্য তৈরি হচ্ছে তারপরও আমি গ্রামের সঙ্গে, নিজের মাটি আর শেকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পক্ষপাতি। গত ২৫ বছর এভাবেই কাটছে। অথচ নিজের সন্তান ৮ বছর বিলেত আছে। দেশে এসেছে মাত্র তিনবার। সে বিলেতের ভিন্ন একটা সংস্কৃতি-জীবন যাপনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আমি জানি না খাপ খাওয়ানো সম্ভব কিনা? শুধু বুঝি উন্নত জীবনের নেশায় সে একটি সংস্কৃতি থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় আসবে যখন তার অবস্থা হবে না ঘরকা না ঘাটকা। সে কোথাও খাপ খাওয়াতে পারবে না। আবার তার সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি আর জীবন কাটানোর নিরাপদ পরিবেশও নিশ্চিত করতে পারছি না। ফলে তাকে এক প্রকার বিচ্ছিন্নতার দিকে নিজেরাই ঠেলে দিয়েছি। এটা তো মেনে নিতেই হচ্ছে। নিশ্চিত জীবন চাইলে এর বাইরে যাবার পথ নেই।' আওলাদ হোসেন ২/৩ মাস পর পর কেন বাড়িতে যান? এর পেছনের কারণ কি? শুধুই কি মাকে দেখতে যাওয়া? শহরে নিরাপদ জীবন থাকার পরও গ্রাম তাকে টানে কেন? আওলাদ হোসেন উত্তর দেন, 'ব্যাপারটা আসলে শহর আর গ্রামের নয়। এটা আরও অনেক বড় ব্যাপার। বলতে পারেন গ্রাম আর শহরের একটা সেতুবন্ধ আমি। অজপাড়াগাঁ থেকে আজ এখানে এসেছি। যে পাড়াগাঁ আমাকে তৈরি করেছে তাকে ভুলে যাই কিভাবে? ব্যাপারটা সাংস্কৃতিক ও মানবিক বটে আমার কাছে।' আর্থিক ভিত্তি আমাদের জীবনের অনেক কিছু কেড়ে নেয়। সচ্ছলতা দেয় সত্য। সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অনেক অস্পষ্ট ভাঙন। রাষ্ট্র স্বাবলম্বী হতে না পারায় জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কাটে প্রতিষ্ঠিত হবার পরীক্ষায়। পাস করতে করতে জীবনের অনেক আনুষঙ্গিক বিষয় হারিয়ে যায়। আওলাদ হোসেন বলেন, 'আমি আজ পর্যন্ত ভুলিনি, কৃষকের সন্তান আমি। কৃষির সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। কখনও শহুরে হতে চেষ্টা করিনি। আমি বলছি না যে শহুরে হওয়া খারাপ। আমি বলছি সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা। শেকড়ের সঙ্গে যদি বন্ধন ছিন্ন হয় তবে বাঁচবো কি করে? আমি সব সময় গ্রামে যে সামাজিকতা দেখে এসেছি সেটাই রক্ষা করতে চেয়েছি। আর্থিক কারণে আমার সমাজে অবস্থান অন্যদের চেয়ে ভালো এটা মানছি। অবস্থা খারাপ হলে যে আমি সব ছেড়েছুড়ে ভিন্ন কিছু হতাম, ব্যাপারটা সেরকম বলে আমার মনে হয় না।' আওলাদ হোসেনের কাছে জীবনের মানে হয়তো অন্যরকম, অনেক কিছু।

পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে। ভাঙে দীর্ঘদিন ধরে রাখা আবেগী সম্পর্ক, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে হয় কয়েক টুকরো। তারপর প্রথম দিকে প্রতি শুক্রবারে যাওয়া-আসা। এক সময় জীবনের জটিলতায় নতুন প্রজন্ম তাও করতে ব্যর্থ হয়। বাবার পরিবার আর পুত্রের পরিবার পৃথক দুটি পরিচিতি বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতা।

বিচ্ছিন্নতাকে আড়াল করছি কখনো জীবন সংগ্রাম নামে, কখনো আত্মকেন্দ্রিকতার নামে, কখনো দুমুঠো ভাতের লড়াইয়ের কথা বলে। আসলে আড়াল নয়, জীবনের লক্ষ্য এখন এমনই যেখানে যেতে হলে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে। অপশনহীন জীবনে বিচ্ছিন্নতাই একমাত্র অপশন।

বিশ্বজুড়ে সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্ব প্রথম একক জীবনের ব্যক্তি স্বাধীনতার ভ্যানগার্ড হয়ে ওঠে শিল্প বিপ্লবের পরই। কারণ পরিবার যত বিচ্ছিন্ন হবে ব্যক্তি যত বিচ্ছিন্ন হবে, বাজার চাহিদার ছাপ বদলে যাবে, চাহিদা সৃষ্টি হবে। এক টিভির দর্শক ছিল ষাট দশকের শেষে অন্তত ৭ থেকে ১৪ জন, এখন দু'তিন জন। এখন ফ্রোজেন খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেছে মানুষের। সবাই এক টেবিলে বসে মায়ের রান্না খায় না। এখন একেকজনের পছন্দ এক এক রকম। এটাও মুক্ত বাজার অর্থনীতি, বিশ্বকে ফ্রিজে ঢোকালেও ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করছে। করছে তার রুচিকে, তার চাহিদাকে। আমরা নিজে ভাবি না, পারিবারিক ভাবনা নেই। ব্যক্তি ভাবনা সম্মিলিত হয় না। কেউ ভেবে রাখছে আমাদের জন্যে- সুপার মার্কেট গেলেই তা বোঝা যায়। প্রতিটি মানুষ একই ধরনের মোড়কের খাদ্য কিনছে- তার নিজস্বতা নেই, চয়েস নেই। এখানে নিউইয়র্কের সঙ্গে পার্থক্য নেই ঢাকার সুপার মার্কেটের। ঢাকায় আসছে ফ্রেঞ্চ-বিন, ক্যাপসিকম, নিউইয়র্কে পাওয়া যায় পদ্মার ইলিশ, পটল। মোড়কের সমন্বয় ঘটছে, মানুষ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। হচ্ছে প্রয়োজনে ভালো থাকার জন্যে। ভালো থাকার সোনার হরিণটা এখনো ছুটন্ত।

ফ্যামিলি ফটো তুলতে হলে এখন অনেক অপেক্ষা করতে হয়। কবে, কোন দিন, কোন মাসে, কোন বছরে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ঘরে আসবে এ অপেক্ষায় থাকতে থাকতে পরিবারের কোনো জীবনগুলো বিয়োগ হতে থাকে। পারিবারিক ছবি আর হয়ে ওঠে না

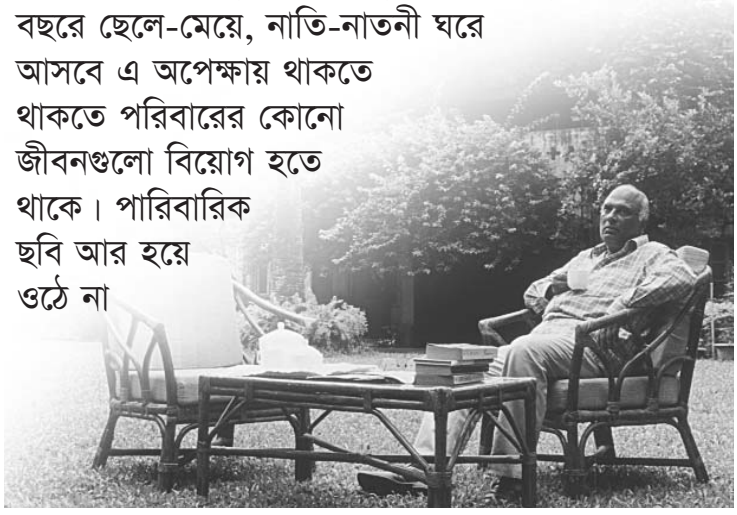

ফ্যামিলি ফটো তুলতে হলে এখন অনেক অপেক্ষা করতে হয়। কবে, কোন দিন, কোন মাসে, কোন বছরে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ঘরে আসবে এ অপেক্ষায় থাকতে থাকতে পরিবারের কোনো জীবনগুলো বিয়োগ হতে থাকে। পারিবারিক ছবি আর হয়ে ওঠে না।

সেই বাড়িটির গৃহকর্তা এখন অপেক্ষায় আছেন তার মেয়ের ও ছেলেদের ঘরে ফেরার। দু'মাস আগে মেয়েটির সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের সঙ্গে পুরো পরিবারের ছবি নেই। ই-মেইলে দেখেছেন তাকে জন্মের দু'ঘন্টার মধ্যেই। কিন্তু বাড়ির দেয়ালে সে এখনও স্থান পায়নি। আমেরিকার অবস্থা ঠিক না হলে ছেলেরাও আসতে পারবে না। অপেক্ষায় থাকতে হবে আর কতদিন? নাতির সঙ্গে কবে ছবিটি তোলা হবে?